আত্মশুদ্ধি

সংগৃহীত হয়েছে ইবন রজব আল-হাম্বলী, ইবন আল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ এবং আবু হামিদ আল-গাযালী এর গ্রন্থসমূহ থেকে

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ ০১। আন্তরিকতা

পরিচ্ছেদ ০২। উদ্দেশ্য ও এর প্রকৃতি

পরিচ্ছেদ ০৩। হৃদয়ের প্রকারভেদ

পরিচ্ছেদ ০৪। অসুস্থ মনের লক্ষণ ও তার স্বাস্থ্যগত চিহ্ন

পরিচ্ছেদ ০৫। হৃদয়ের চারটি ক্ষতিকর বিষয়

পরিচ্ছেদ ০৬। আল্লাহর স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত

পরিচ্ছেদ ০৭। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

পরিচ্ছেদ ০৮। দুয়া

পরিচ্ছেদ ০৯। রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠ

পরিচ্ছেদ ১০। কিয়ামুল লাইল(রাতের ইবাদাত)

পরিচ্ছেদ ০১

আন্তরিকতা

আন্তরিকতা হল মহান আল্লাহর নিকটে আসার নিমিত্তে যে কোন ধরনের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আর তাই সকল ইবাদাত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এটা হল আল্লাহর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকার ব্যাপ্তি যে পর্যায়ে একজন সৃষ্টি সম্পর্কেই বিস্মৃত হয়ে যায়।

আন্তরিকতা হল এমন একটি অবস্থা যখন কোন কাজ রাসুলের (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা কবুল করেন। আল্লাহ এ ব্যাপারে কুরআনে আদেশ করেছেন-

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" (৯৮:৫)

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, একদা এক লোক রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করল- "সেই ব্যাক্তির কী হবে যে আমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু যার উদ্দেশ্য ছিল খ্যাতি ও মুনাফা অর্জন?" রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- "সে কিছুই পাবে না।" লোকটি প্রশ্নটি তিনবার করল এবং প্রতিবারই রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই কথা বললেন। এরপর তিনি বলেন- "আল্লাহ সে সকল কাজই কবুল করে থাকেন যা কেবলমাত্র তাঁরই খুশির জন্য করা হয়ে থাকে।" [১]

আবু সায়্যিদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন-

আল্লাহ তাদের মহিমান্বিত করবেন যারা আজকের কথাগুলো শুনবে এবং যারা তা উপলব্ধি করবে, এটা এ কারনে যে আজকে যারা এই কথাগুলো অনুপস্থিত ব্যাক্তিদের বলবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। মুমিনের হৃদয় তিনটি বিষয়ে কখনো বিরোধ বা প্রতিহিংসা অনুভব করতে পারে না- আল্লাহর ইবাদাতে কারো আত্মনিয়োগ, মুসলিম উম্মাহর ইমামদের পরামর্শ দান এবং জামায়াতবদ্ধ থাকা।[২]

এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হল এই তিনটি বিষয় হৃদয়কে মজবুত করে এবং যারা এই বিষয়গুলোতে নিজেদের আলাদা করতে পারে তারা শঠতা দুর্নীতি ও মন্দ থেকে বিবর্জিত এক পবিত্র হৃদয় এর অধিকারী হয়।

একজন বান্দা শুধুমাত্র আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই শয়তান এর বিতাড়িত পথ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, একারনেই আল্লাহ কুরআনে বলেন যে ইবলিস বলল-

"তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।" (৩৮:৮৩)

এ কথা বর্ণিত আছে যে এক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যাক্তি বলতেন- "হে স্বীয় আত্মা, একনিষ্ঠ হও তবেই তুমি পবিত্র হতে পারবে"। যখন কোন পার্থিব সাফল্য যার মাঝে স্বীয় আত্মা স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে বেড়ায় এবং যার দিকে হৃদয় ঝুঁকে থাকে তা আমাদের ইবাদাতে বাধা দান করে, আর তখনি তা আমাদের কাজের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এবং আমাদের

আন্তরিকতার মৃত্যু ঘটায়। মানুষ স্বভাবতই সাফল্য দ্বারা আচ্ছন্ন এবং ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির দাস; তার কাজ বা ইবাদাত খুব কমই এ ধরনের বাসনা থেকে মুক্ত। এ কারনে বলা হয়ে থাকে, আল্লাহর রাহে ব্যয়িত একটি মুহূর্ত যে নিশ্চিত করবে সে মুক্তি পাবে যেহেতু একনিষ্ঠতা বিরল ও মূল্যবান সম্পদ এবং হৃদয় কে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা প্রতিশ্রুতির দাবিদার।

প্রকৃতপক্ষে একনিষ্ঠতা হল সকল অশুদ্ধতা (কম বা বেশি) থেকে নিজেকে দূরে রাখা যাতে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বাসনা অন্য সব ইচ্ছা থেকে মুক্ত থাকতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতিত। এটা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব যে কিনা আখিরাতের প্রতি এতটাই নিবেদিত যার দরুন তার এই পৃথিবীর প্রতি আর কোন ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে না। এই ধরনের ব্যাক্তি খাওয়া দাওয়া ও জৈবিক প্রয়োজনসহ যে কোন কাজেই একান্ত নিষ্ঠাবান। এই ধরনের বিরল ব্যতিক্রম বাদে অন্য যে কেউই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে।

একজন মানুষের দৈনন্দিন কাজ যা সে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে করে থাকে মূলত এটাই হচ্ছে নিখাদ একনিষ্ঠতা। ঠিক একইভাবে যারা নিজেদের দুনিয়া এবং এর পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন করে রাখে তারা কখনই কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না হোক তা সালাত অথবা সিয়াম।

এই সমস্যার সমাধান হল নিজের স্বকীয়তাকে দুনিয়াবী আসক্তি থেকে বিরত রাখা এবং পরকালের প্রস্তুতির নিমিত্তে একে সংশোধন করা। ফলস্বরূপ একনিষ্ঠতা অর্জন করা অনেক বেশি সহজ হবে। এরকম অনেক কাজই রয়েছে যা মানুষ মনে করে তা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়েছে কিন্তু সে ধোঁকার মধ্যে থাকে একারনে যে সে ঐ কাজের ত্রুটি বের করতে অসমর্থ হয়।

এটা বর্ণিত আছে যে এক লোক সর্বদা প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত। একদিন সে দেরি করে ফেলল এবং দ্বিতীয় কাতারে সালাত আদায় করল। যখন অন্যান্য মুসল্লিরা তাকে দ্বিতীয় কাতারে দেখল তখন সে লজ্জিত বোধ করল, সে বুঝতে পারল যে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে সে যে আনন্দ ও সন্তুষ্টি পেয়ে আসছিল তা ছিল লোক দেখানো ও অন্যান্য মুসল্লিদের প্রশংসার কারনে। এটা খুবই সূক্ষ্ম এবং অস্পৃশ্য অবস্থা যা থেকে কোন কর্মই নিরাপদ নয়। কিন্তু তাদেরকে ব্যতিরেকে যারা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত তারা এসব দুর্বল ব্যাপারে সতর্ক। যারা এ ব্যাপারগুলো অনুধাবন করতে অপারগ তারা নিজেদের ভাল কাজগুলো পুনরুত্থান দিবসে মন্দ হিসেবেই পাবে, আল্লাহ বলেন-

“আর দেখবে, তাদের দুস্কর্মসমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে।” (৩৯:৪৮)

আল্লাহ আরও বলেন-

“বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।” (১৮:১০৩-১০৪)

ইয়াকুব বলেন- “একনিষ্ঠ ব্যাক্তি হচ্ছে সেই যে ভাল বিষয়াদি গোপন করে যেভাবে সে খারাপ বিষয়াদি গোপন করে থাকে।”

আস-সউসি বলেন- “সত্য নিষ্ঠা হল নিষ্ঠায় থাকা অবস্থায় অচেতন হয়ে যাওয়া, যে ব্যক্তি নিষ্ঠাকে তার নিষ্ঠা থাকাকালীন নির্ণয় করতে পারে সে ব্যক্তি নিষ্ঠার প্রয়জনেই নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে।” নিষ্ঠা নিয়ে ভাবার মানে হল এর

প্রশংসা করা আর প্রশংসা হল পরিতাপের বিষয়। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে ব্যক্তি বিশেষের যে কোন কাজ সকল প্রকার তারিফ থেকে মুক্ত হতে হবে।

আইয়ুব বলেন- "যে কোন কাজ করার চাইতে তা করার ইচ্ছার শুদ্ধতা অনেক বেশি কঠিন।"

কতিপয় জ্ঞানী বলেন- "ক্ষণিকের জন্য নিষ্ঠাবান হওয়া মানে চিরকাল বেঁচে থাকা যেহেতু একনিষ্ঠতা নিতান্তই অপ্রতুল।"

সুহাইলকে জিজ্ঞেস করা হল- নিজের জন্য সবচাইতে কঠিন বিষয় কি? তিনি বলেন- "একনিষ্ঠতা, যখন মানুষ তার দুঃসময়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে।"

আল-ফুদায়িল বলেন- "মানুষের জন্য নিজের কর্ম পরিত্যাগ করার অর্থ হল তাদের প্রশংসা খোঁজা আর এর মানেই হল আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। একনিষ্ঠতা তখনি পূর্ণতা পাবে যখন আল্লাহ এই দুই অবস্থা থেকেই কাউকে মুক্ত করবে।"

টীকাঃ

(১) সহীহ আন নিসাঈ, কিতাব উল জিহাদ, ৬/২৫; আল-হাফিয ইবন হাযার, ফাতহ আল কাদির,৬/২৮

(২) সহীহ ইবন মাজাহ; এছাড়াও ইবন হিব্বান, মাওয়ারিদ আদ-ধামআন, পৃ ৪৭, যায়িদ বিন সাবিত এর সূত্র ধরে।

পরিচ্ছেদ ০২

উদ্দেশ্য ও এর প্রকৃতি

একজন মানুষের অভিপ্রায় এর অর্থ এই নয় যে "আমি এই এই কাজগুলো করব" এর মৌখিক উচ্চারণ। এটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হৃদয় নিঃসৃত উচ্ছ্বাস যা বিজয়ের বেশে ধাবিত হয়। কালভেদে এটি সহজ থেকে কঠিন ও হতে পারে। একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সিংহভাগ সময়েই ভাল অভিপ্রায়গুলো খুঁজে নিতে পারে। এধরনের ব্যক্তির হৃদয় সাধারণত ধার্মিকতার মৌলিক বিষয়গুলোতে অনুরক্ত থাকে যা অধিকাংশ সময়েই ভাল কাজের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়। আর যাদের হৃদয় দুনিয়াবী বিষয় দ্বারা আনত তারা এই কাজগুলো করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এমনকি অবশ্য পালনীয় ইবাদাত ও তাদের কাছে কঠিন এবং ক্লান্তিকর মনে হয়।

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী । অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে । আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিল করার জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গন্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[১]

ইমাম আশ-শাফিঈ বলেন- "এই হাদিসটি হল সকল জ্ঞান এর এক তৃতীয়াংশ।" "কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত" কথাটির অর্থ হল যে সকল কাজ সুন্নাহ অনুযায়ী করা হয় কেবলমাত্র সে সকল কাজই গৃহীত এবং পুরস্কৃত হয় যদি তার পেছনের উদ্দেশ্য অকৃত্রিম হয়। এটা অনেকটা রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীর মতই- "কর্ম তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে"।[২]

ঠিক একইভাবে "প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী" এর অর্থ হল প্রত্যেক কাজের পুরস্কার তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই নীতির কথা উল্লেখ করে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদাহরন দিয়ে বলেন- "অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে । আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিল করার জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গন্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে"। সুতরাং যে সকল কাজ বাহ্যত দেখতে একই লাগে তা মূলত ভিন্ন হতে পারে মানুষের অভিপ্রায় এর ভিন্নতার দরুন ভাল ও খারাপ এর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়।

ভাল উদ্দেশ্য কখনো নিষিদ্ধ কর্মের প্রকৃতি পরিবর্তন করে না। অজ্ঞ লোকের এই হাদিসের ভুল অর্থ বের করা উচিত নয় এবং এটা ভাবা ঠিক নয় যে সৎ উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ কাজকে গ্রহণযোগ্য কর্মে পরিণত করবে। উক্ত হাদিসটি শুধুমাত্র ইবাদাত ও অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইবাদাত ও অনুমোদিত কাজগুলো অভিপ্রায় এর কারনে নিষিদ্ধ কর্মে পরিণত হতে পারে, এবং অনুমোদিত কর্ম ইচ্ছার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভাল বা খারাপ দুইই হতে পারে কিন্তু খারাপ কাজ কখনো ইবাদাত হতে পারে না যদিও তার পেছনের উদ্দেশ্য ভাল হয়।[৩] এক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রাও বহুগুনে বর্ধিত হবে।

যে কোন প্রশংসনীয় কাজের মূল হতে হবে দৃঢ় ইচ্ছা, কেবল তখনি তা পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে কোন ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে, এটাই মৌলিক নীতি। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় মনোরঞ্জন, তবে উক্ত ভাল কাজই অবাধ্য কাজে পরিণত হবে। অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রে, সৎ উদ্দেশ্য জড়িত যা কাজগুলোকে গ্রহণযোগ্য করে একজন মানুষকে আল্লাহর নিকটে আনয়নের মত যোগ্য করে তুলে।

অভিপ্রায় এর শ্রেষ্ঠত্ব

উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "সবচেয়ে ভাল কাজ হল আল্লাহ যা আমাদের আদেশ করেছেন, যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং আল্লাহ যা আমাদের থেকে চান তার প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য স্থির করা।" [৪]

আমদের কিছু পূর্বপুরুষ বলে থাকেন- "অনেক ছোট কাজকেও বড় করা যায় একনিষ্ঠ ইচ্ছা দ্বারা আর অনেক বড় কাজও ছোট হয়ে যায় ইচ্ছার স্বল্পতার কারনে।"

ইয়াহিয়া ইবন আবু কাসীর বলেছেন- "উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যেহেতু এটা কাজের চাইতেও বেশি গুরুত্ববহ।"

ইবন উমার একদা এক ব্যক্তিকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বলতে শুনলেন- "ও আল্লাহ, আমি হাজ্জ ও উমরা করতে মন স্থির করেছি।" অতঃপর তিনি তাকে বললেন- "এটা কি এই নয় যে তুমি লোকজনকে তোমার ইচ্ছার ব্যাপারে অবহিত করছ? আল্লাহ কি ইতোমধ্যেই জ্ঞাত নন যে তোমার অন্তরে কি রয়েছে?"[৫] এটা এই কারনে যে সদিচ্ছা একান্তভাবেই হৃদয়ের অন্তর্গত, তা লোকসমক্ষে জাহির করার কোন অবকাশ নেই।

জ্ঞান ও শিক্ষাদান এর শ্রেষ্ঠত্ব

পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও এর প্রচার এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত বহু প্রমাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (৫৮:১১)

এছাড়াও বলেন-

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" (৩৯:৯)

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যখন আল্লাহ কারো ভাল চান, তখন তিনি তাকে দ্বীন বোঝার জ্ঞান দান করেন।"[৬] তিনি আরও বলেন- "আল্লাহ জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।" [৭]

জ্ঞান লাভের অন্বেষণে ভ্রমন বলতে যেমন প্রকৃত পথ বরাবর চলা (উলামাদের পথ) বোঝায়, ঠিক তেমনিভাবে এটা অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করার মত আধ্যাত্মিক পথে চলাকেও নির্দেশ করে।

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরোক্ত উক্তিটি সম্ভবত এটাই ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ উপকারি জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তির জন্য কাজটি সহজ করে দেন তার পথ থেকে সমস্ত বাধা দূর করে। আমাদের কিছু পূর্বপুরুষ বলে থাকেন- "কেও কি আছে জ্ঞান অন্বেষণে মগ্ন, যাতে করে আমরা তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি?"

এই হাদিসটি শেষ বিচারের দিনে জান্নাত লাভের পথকেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে, যেটা সরল পথ এবং এর পূর্বে ও পরের সকল কার্যাবলীর নির্দেশক।

জ্ঞান হল আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সবচাইতে সহজ পথ। যে কেও এই পথে পরিভ্রমন করবে সে খুব সহজে আল্লাহ এবং তার জন্য নির্ধারিত জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। জ্ঞান অন্ধকার, অজ্ঞতা, সন্দেহ ও সংশয় থেকে পথকে সুগম করে তোলে। এই জন্যই আল্লাহ তাঁর কিতাবকে "আলো" বলে অভিহিত করেছেন।

আল-বুখারী এবং মুসলিম, আব্দুল্লাহ ইবন উমার হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলম কেড়ে নেবেন না । তবে তিনি আলিম শ্রেনীকে কবয করে ইলম তুলে নেবেন । যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে । তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাতওয়া দিবে । এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

যখন উবাদা ইবন আস-সামিতকে উক্ত হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বলেন- যদি তুমি চাও, তবে আমি তোমাকে বলব সর্বোচ্চ জ্ঞান কি যা মানুষের মর্যাদা উঁচু করে? আর তা হল নম্রতা।

বস্তুত জ্ঞান হচ্ছে দুই প্রকার। যার প্রথমটি অন্তরে এর প্রভাব বিস্তারিত করে। আর এই জ্ঞান এর পরিধি হল আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত – তাঁর গুণবাচক নামসমূহ, তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাঁর আইন যা আদেশ করে তাঁর প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা, উল্লাস, ভালবাসা, মিনতি ও নির্ভরতা প্রদর্শনের। এটাই হল উপকারি জ্ঞান। এ কারনেই ইবন মাসউদ বলেন- তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের অন্তরে পৌঁছবে না। কুরআন শুধুমাত্র তখনি উপকারি হবে যখন তা হৃদয়ে পৌঁছবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে।

আল-হাসান বলেন- "দুই প্রকারের জ্ঞান রয়েছে। প্রথমটি হল জিহবা সম্পর্কিত জ্ঞান যা আদম সন্তানের ক্ষতির কারণ হতে পারে যার ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ কুরআন আদম সন্তানের পক্ষে বা বিপক্ষে দুইই হতে পারে,[৮] এবং অন্তরের জ্ঞান যা হল লাভজনক। শেষোক্তটি উপকারি এই কারনে যে এটি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে; এটাই হল অন্তর্নিহিত জ্ঞান যা হৃদয়গ্রাহী এবং এটাকে সমুন্নত রাখে। যে জ্ঞান জিহবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যা সে নিজেও জানে না এবং অন্যরাও নয়, সে জ্ঞান শেষ বিচারের দিনে কোন কাজে আসবে না যেহেতু তা উক্ত ব্যক্তির বিলুপ্তির সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

টীকাঃ

(১) আল-বুখারী ও মুসলিম

(২) আল-বুখারী, কিতাব আল ক্বাদর, ১১/৪৯৯

(৩) এটি মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে; আবু যার (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) এর সাহাবীদের কয়েকজন নবী (সা) -কে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বিত্তবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের মত সালাত আদায় করেন, আমাদের মত সিয়াম সাধনা করেন এবং তারা নিজেদের ধন সম্পদ হতে কিছু দান করে থাকেন । তিনি বললেন, তোমাদের জন্য কী আল্লাহ তাআলা সাদাকা করার ব্যবস্হা করেননি? প্রতিটি তাসবীহ সাদাকা, প্রতিটি তাকবীর সাদাকা প্রতিটি তাহমীদ সাদাকা, প্রতিটি তাহলীল সাদাকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে বিরত রাখা

সাদাকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও সাদাকা । তারা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কেউ যদি স্ত্রী সংগম করে এতেও কি সে সাওয়াব পাবে? তিনি বললেন তোমরা কি মনে কর যদি সে কামাচার করে হারাম পথে তাতে কি তার পাপ হবে না? অনুরুপভাবে যদি সে কামাচার করে হালাল পথে তবে সে সাওয়াব পাবে ।

(৪)তাহদ'হীব আল-আসমা লি-নববী, ১/১৭৩। আবু ইশাক একদিন মসজিদে প্রবেশ করলেন কিছু খাওয়ার জন্য যা তার স্বভাবজাত আচার ছিল, এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তার কাছ থেকে এক দিনার পড়ে গেছে। তিনি পূর্বপথ অনুসরণ করলেন এবং তা ভুমিতে দেখতে পেলেন কিন্তু তিনি তা সেখানে রেখে এই বলে চলে আসলেন যে-"প্রকৃতপক্ষে এটা আমার নয়; হতে পারে এটা অন্য কারো দিনার"

(৫)সহীহ জামি-উল-উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ ১৯

(৬) আল-বুখারী ও মুসলিম

(৭) মুসলিম, ২১/১৭

(৮) মুসলিম, কিতাব আত-তাহারা, ৩/৯৯

পরিচ্ছেদ ০৩

হৃদয়ের প্রকারভেদ

হৃদয়কে যেভাবে জীবিত বা মৃত বলে বর্ণনা করা যায় ঠিক একইভাবে একে সুস্থ মন, মৃত মন ও অসুস্থ মন- এই তিন প্রকারের অন্তর্গত বলে গণ্য করা যায়।

সুস্থ মন

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সামনে যারা সুস্থ মন নিয়ে হাজির হবে কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে। আল্লাহ বলেন-

“যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।” (২৬:৮৮-৮৯)

সুস্থ হৃদয়কে এভাবে সঙ্গায়িত করা যায়- এ হল আবেগমুক্ত মন যা আল্লাহর যে কোন আদেশ বা নিষেধ পালনে বদ্ধপরিকর। এটি ভাল কিছুতে বাধাদানকারী যে কোন প্রবৃত্ত থেকে মুক্ত। ফলশ্রুতিতে এটি আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে রক্ষা করে এবং রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে গণ্য করে। এটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই বরাদ্দ, স্বেচ্ছায় ও সস্নেহে, পূর্ণ ভরসায়, তাঁর সাথে জড়িত সকল কাজে যেমন ভয়, আশা ও আন্তরিক নিষ্ঠা। যখন সে ভালবাসে তখন শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। যখন সে ঘৃণা করে তখন শুধু আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে। যখন সে দান করে তখন আল্লাহর জন্যই দান করে। যখন সে ব্যয় করে না তখন সে আল্লাহর জন্যই তা করে না। তা সত্ত্বেও এ সবকিছু তার পরিতৃপ্তির জন্য পর্যাপ্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতিত অন্য কারোর অনুসরনে হয়।

একজন সুস্থ মনের মানুষ তার সকল কাজ তার জীবনের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে সচেষ্ট এবং তার এসকল কথা ও কাজ একমাত্র রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতিত অন্য কারো উপর নির্ভরশীল নয়। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতিত অন্য কোন বিশ্বাস বা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে না, আল্লাহ তাকে রহম করুন ও শান্তি প্রদান করুন। আল্লাহ বলেন-

“মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।” (৪৯:১)

মৃত মন

এটি হল সুস্থ মনের বিপরীত। এটা তার মালিক কে চিনে না এবং তাঁর মত করে তাঁকে ডাকে না, তিনি যেভাবে চান ও তিনি যেভাবে খুশি হন। এটা বরং কামনা বাসনা নিয়েই আটকে থাকে যদিও বা তা আল্লাহর অপছন্দ ও ক্রোধের কারণ হয়। এ ধরনের হৃদয় শিরক করে থাকে এবং তার প্রেম ও ঘৃণা, প্রদান ও প্রতিসংহার সবই খেয়াল খুশিমত হয়ে থাকে, যা সে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে আল্লাহর খুশিকে বাদ দিয়ে। তার ঝোঁক হল তার ইমাম। তার লালসা হল তার পথ প্রদর্শক। তার অজ্ঞতা হল তার নেতা। তার অশোধিত প্রবৃত্তি হল তার চালিকা শক্তি। এ মন দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। এটা তার নিজস্ব স্বপ্ন এবং হঠকারী ও অস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত। একে

আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে ডাকা হয় কিন্তু এ কোন উপদেশ এর তোয়াক্কা করে না বরঞ্চ শয়তান প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। জীবন তাকে বিরক্ত ও পরিতৃপ্ত করে, এবং আবেগ তাকে মন্দ ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে বধির ও অন্ধ করে তোলে।[১]

এ ধরনের হৃদয়ের লোকের সাথে সহযোগী হওয়ার মানে ব্যাধি আনয়ন, তার সাথে থাকা মানে বিষ গ্রহন, এবং তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মানে চূড়ান্ত সর্বনাশ।

অসুস্থ মন

এটি এমন এক হৃদয় যাতে জীবনও আছে ব্যাধিও আছে। কোন কোন সময় পূর্বেরটি বিদ্যমান থাকে আর কখনোবা অন্যটি, এবং এটা তাকেই অনুসরণ করে যখন দুয়ের মধ্যে যে কর্তৃত্ব লাভ করে। এর মাঝে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও আস্থা রয়েছে, এবং এসবই তাকে জীবন দান করে। এছাড়াও এর মাঝে কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষুধা বিদ্যমান যা সে পছন্দ করে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষে সংগ্রাম করে। এটি আত্মতুষ্টিতে পরিপূর্ণ যা তাকে নিজের সর্বনাশের দিকে ধাবিত করে। এটা দুই দিকের আহবানেই সাড়া দেয়ঃ একটি হল আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আখিরাত এর দিকে আর অন্যটি হল দুনিয়াবী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। যখন যার বেশি প্রভাব থাকে তখন সে তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

প্রথম অন্তরটি হল জীবিত, আল্লাহর জন্য নিবেদিত, নম্র, আন্তরিক ও সচেতন; দ্বিতীয়টি হল ভঙ্গুর ও মৃত; আর তৃতীয়টি তার নিরাপত্তা ও ধ্বংসের মাঝে দোদুল্যমান।

টীকাঃ

(১) আবু দারদা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেবে।” আবু দাউদ, আল-আদাব, ১৪/৩৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/১৯৪। হাদিসটি হাসান।

পরিচ্ছেদ ০৪

অসুস্থ মনের লক্ষণ ও তার স্বাস্থ্যগত চিহ্ন

অসুস্থ মনের লক্ষণসমূহ

একজন বান্দার মন অসুস্থ হতে পারে, এবং গভীরভাবে আরও মন্দের দিকে ধাবিত হতে পারে যখন সে এ ব্যাপারে বিস্মৃত থাকে। তাকে না জানিয়ে এর মৃত্যুও ঘটতে পারে। মনের অসুস্থতার লক্ষণসমূহ অথবা তার মৃত্যুর চিহ্নগুলো মূলত তার মালিকের কৃত খারাপ কাজের ফল যা সে সত্য না জেনে অবিচলিত থাকে অথবা সে তার অন্ধবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ় অবস্থান পোষণ করে।

যেহেতু জীবিত হৃদয় যে কোন ধরণের কদর্যতার দরুন ব্যাথা অনুভব করে এবং এর মধ্য দিয়ে সে সত্য সম্পর্কে যে অজ্ঞতা তার মধ্যে রয়েছে তা সে উপলব্ধি করতে পারে (সচেতনতার মাত্রা পর্যন্ত), এটা নিজের পতনের সূত্রপাত চেনাতে সমর্থ এবং তা রোধ করতে যে পরিমাণ কঠিন প্রতিকার এর প্রয়োজন তা বৃদ্ধিতে সক্ষম, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এটা কষ্ট সহ্য করার সাথে আপোষ করে নেয় এবং এর প্রতিকারের যে শ্রমসাধ্য পরীক্ষা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অসুস্থ মনের লক্ষণসমূহের মধ্যে কয়েকটি হল হালাল খাদ্য ত্যাগ করে হারাম খাদ্য গ্রহণ, ভাল প্রতিকার ছেড়ে লজ্জাজনক অসুস্থতার দিকে ধাবিত হওয়া। সুস্থ মন ক্ষতিকর জিনিষের চাইতে উপকারী জিনিষ পছন্দ করে যেখানে অসুস্থ মন তার বিপরীত। হৃদয়ের জন্য সবচাইতে উপকারী খাদ্য হল ঈমান এবং সেরা ওষুধ হল কুরআন।

সুস্থ মনের লক্ষণসমূহ

হৃদয়কে সুস্থ হতে হলে একে এই জীবন থেকে প্রস্থান করতে হবে ও পরকালের দিকে ঝুঁকতে হবে, এবং তাকে পরকালের একজন বাসিন্দা ভাবতে হবে। তাকে এমনভাবে চলতে হবে যেন সে একজন মুসাফির, শুধুমাত্র যা প্রয়োজন তা ব্যয় করে আবার বাড়ি ফিরে যাবে। যেমনটি নবী করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবন উমার কে বলেছিলেন- "এই দুনিয়াতে এমনভাবে চল যেন তুমি একজন মুসাফির।"[১] হৃদয় যতই রোগাক্রান্ত হবে দুনিয়ার প্রতি লালসাও ততই বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নিজেকে এরই একজন মনে করে।

এ ধরণের মন তার মালিককে প্রতিনিয়ত বিরক্ত করতে থাকে যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে এবং তার সাথে সাক্ষাত করে শান্তি অর্জন করে প্রিয়জনকে কাছে ফিরে পাবার মত। তাঁকে ভালবাসাই তার মূল লক্ষ্য এবং তাঁকে স্মরণই তার একমাত্র কাজ। তাঁর খিদমতই সুস্থ হৃদয়ের একনিষ্ঠ দায়িত্ব।

যদি এ মন কোনক্রমে কুরআন তিলাওয়াত অথবা আল্লাহর যিকর করতে ভুলে যায় তবে তার মালিক তার চাইতেও বেশি উদ্বিগ্ন হয় যতটা না একজন সাবধানী ব্যক্তি তার ধন সম্পদ বা কোন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে। সে এমনভাবে থাকতে চায় যেমনিভাবে একজন অনাহারী ব্যক্তি খাবার ও পানির জন্য মুখিয়ে থাকে।

ইয়াহিয়া ইবন মুয়ায বলেন- "যে আল্লাহকে খিদমত করে সন্তুষ্ট, তাকে বাকি সবকিছুই খিদমত করে সন্তুষ্ট হবে; এবং যে আল্লাহর ধ্যান করে সুখ লাভ করে, অন্য যে কোন মানুষ তার চিন্তা করে আনন্দিত হয়।"

সুস্থ মনের শুধুমাত্র একটাই চিন্তাঃ তা হল তার সকল কাজ, ভেতরের চিন্তা ও নির্বচন, তা যেন আল্লাহর জন্যই হয়। এ মন সময় নিয়ে ততটাই মনযোগী থাকে যতটা না একজন কৃপণ ব্যক্তি তার টাকা পয়সা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে যেন এর অপচয় না হয়। যখন সে ইবাদাতে মনোনিবেশ করে তখন তার দুনিয়াবী সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে তার মালিকের ইবাদাতে সুখ ও স্বস্তি খুঁজে পায়। সে মহান আল্লাহকে খিদমত করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয় না এবং সে কেবল এটাই স্মরণ করতে থাকে যে আল্লাহ ছাড়া কেওই তাকে বাচাতে সক্ষম নয়।

সে তার কাজের চাইতে বেশি মনোযোগ দেয় এর শুদ্ধতার দিকে। সে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকে যে তার সকল কাজের পেছনের নিয়ত পবিত্র এবং ফলস্বরূপ তা যেন ভাল কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

এছাড়াও এবং উপরে বর্ণিত কথা সত্ত্বেও, এটা শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে না যে ভাল কাজ করা কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহর কারণেই সম্ভব বরং এটা এও সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ এ ধরণের কাজ করতে কতটা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত।

অসুস্থ হৃদয়ের কারণসমূহ

যে সমস্ত প্রলোভন দ্বারা মন প্রভাবিত, মূলত তা ই মনের অসুস্থতার কারণ। এগুলো হল কামনা বাসনা ও কল্পিত স্বপ্নের প্রলোভন। প্রথমটি নিজেকে বিকৃত করার ইচ্ছা ও ঝোঁক তৈরি করে আর শেষোক্তটি জ্ঞান ও ঈমান লোপ পেতে সাহায্য করে।

হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- “চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে । যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে । আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে । এমনি করে দুটি অন্তর দুধরনের হয়ে যায় । একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিতনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না । আর অপরটি হযে যায় উল্টানো কালো কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেঁধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালমন্দ বলতে সে কিছুই সে চিনে না।”[২]

মহানবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রলোভনপ্রাপ্ত অন্তরকে দুভাগে ভাগ করেছেন- এক,

সে হৃদয়, যা প্রলোভন দ্বারা প্রাভাবিত, তা স্পঞ্জ দ্বারা পানি শোষণ এর মত চুপসে যায় এবং তাতে কালো দাগ রেখে দেয়। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত শোষণ করতে থাকে যতক্ষণ না তা অন্ধকার ও বিকৃত হয়ে যায় যাকে তিনি উল্টানো কালো কলসির সাথে তুলনা করেছেন। যখন এই অবস্থা তৈরি হয় তখন দুটি বিপদজনক ব্যাধি একে আঁকড়ে ধরে এবং তাকে ধ্বংসের দিকে নিমজ্জিত করে-

প্রথমটি হল ভালকে খারাপের সাথে এমন পর্যায় পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলা যে সে প্রথমোক্তটি চিনতে পারে না এবং পরবর্তী বিষয়টি বর্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ অসুস্থতা তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে যে ভালকে মন্দ ভাবে এবং তদ্বিপরীত, সুন্নাহ কে বিদ’আহ মনে করে এবং তদ্বিপরীত, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য মনে করে।

দ্বিতীয়টি হল তার কামনা বাসনাকেই সে বিচারক মনে করে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুশাসনকে খণ্ডন করে, যার কারণে তা প্রবৃত্তি ও বাসনার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে এবং এর দ্বারাই চালিত হয়।

পবিত্র মন হল তাই যাতে ঈমানের আলো জ্যোতির্ময় থাকে এবং যেখান থেকে তার আভা বিচ্ছুরিত হয়। প্রলোভন যখন পবিত্র মনের সামনে উপস্থাপিত হয় তখন তা বাধা দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে, ফলশ্রুতিতে তার আলো এবং প্রতিভাস কেবল বৃদ্ধিই পায়।

টীকাঃ

(১) আল-বুখারী, কিতাব আর-রিকাক, ১১/২৩৩

(২) মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, ২/১৭০ (ভিন্ন শব্দাবলী সহকারে)

পরিচ্ছেদ ০৫

হৃদয়ের চারটি ক্ষতিকর বিষয়

প্রত্যেকেরই এটা জেনে রাখা উচিৎ যে সকল প্রকার অবাধ্যতাই হচ্ছে হৃদয়ের ক্ষতিকর দিক এবং এসবই তার অসুস্থতা ও ধ্বংসের কারণ। ফলশ্রুতিতে তা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতায় রূপ নেয় এবং এ ব্যাধি স্থায়ী ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইবন মুবারাক বলেন-

আমি দেখেছি মন্দ কাজ হৃদয় হরণ করতে
এবং তাদের অবক্ষয় মন্দ কাজের প্রতি আসক্ত করে তোলে
মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা
হৃদয়কে করে স্বতঃস্ফূর্ত
এবং নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ

যে কেও তার মনের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত, তার উচিত এর ক্ষতিকর দিক থেকে দূরে থাকা এবং তাকে রক্ষা করা। যদি সে কোন ভুল করে তবে তার উচিত দ্রুত তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভাল কাজ করা যাতে করে তা মন্দকে দূরীভূত করে দেয়।

চার ধরণের ক্ষতিকর দিক হল অতিরিক্ত কথা বলা, অসংযত দৃষ্টি, অধিক ভোজন এবং অসৎ সঙ্গ। সকল প্রকার ক্ষতিকর দিকগুলোর চাইতে এই চারটি হল সবচাইতে বিস্তৃত ও প্রভাবশালী।

অতিরিক্ত কথা বলা

আল-মুসনাদে উল্লেখ আছে, আনাস থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “একজন বান্দার ঈমান কখনো বিশুদ্ধ হবে না যে পর্যন্ত না তার হৃদয় বিশুদ্ধ হয় এবং তার হৃদয় ততক্ষণ না বিশুদ্ধ হবে যতক্ষণ না তার জিহ্বা বিশুদ্ধ হয়।”[১] সুতরাং ঈমানের শুদ্ধতার জন্য মনের সুদ্ধতা জরুরি আর মনের শুদ্ধতার জন্য জিহ্বার শুদ্ধতা অত্যাবশ্যকীয়।

আত-তিরমিজিতে ইবন উমার এর বরাত দিয়ে এসেছে- “আল্লাহর স্মরণ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কথা বোলো না কারণ তা মনকে কঠিন করে তোলে এবং কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তিরাই আল্লাহর কাছ থেকে সবচাইতে দুরে।”[২]

উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত- “যে ব্যক্তি অধিক কথা বলে সে ব্যক্তি অধিক ভুল করে এবং যে সর্বদা ভুল করে থাকে তার সকল কাজেই ভুল হয়। এ ধরণের ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম এর আগুন এর অগ্রাধিকার রয়েছে।”[৩]

মুয়ায হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- আমি কি তোমাদের বলব না কিভাবে তোমরা এসব নিয়ন্ত্রন করবে? আমি বললাম, বলুন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি জিহ্বায় হাত দিয়ে দেখালেন এবং বললেন- একে বিরত রাখো। ইয়া রাসুল্লাল্লাহ, আমরা যা বলি তার জন্য কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেন- তোমাদের মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুয়ায! লোকদের অধ:মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই যবানের কামাই ছাড়া আর কি কিছু আছে নাকি?[৪]

এখানে যা বলা হয়েছে তা হল জিহ্বার ফসল হল মন্দ কথা বলার শাস্তি। একজন মানুষ তার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে ভাল খারাপের বীজ বপন করতে পারে। পুনরুত্থান দিবসে সে এর ফল লাভ করবে। যে ভাল কথা ও কাজের বীজ বপন করবে সে সম্মান ও কল্যাণ সাধন করবে আর যে মন্দ কাজ ও কথার বীজ বপন করবে সে অনুতাপ ও আক্ষেপের ফসল ঘরে তুলবে।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত- "মানুষের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ হওয়ার প্রধান দুটি অঙ্গ হল- জিহ্বা ও লজ্জাস্থান।"[৫]

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "মানুষ এমন কথা বলে যার পরিনতি সে উপলব্ধি করে না এবং সে কারণে সে এমনভাবে আগুনে নিমজ্জিত হবে যার দূরত্ব পূর্ব পশ্চিমের চাইতেও বেশি।"[৬]

একই হাদিস আত-তিরমিজি তে এসেছে একটু ভিন্নভাবে।"মানুষ এমন কিছু বলে যা সে মনে করে ভাল এবং তা ই তার জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ যার দূরত্ব সত্তর বছর।"[৭]

উকবা বিন আমর বলেন- আমি বললাম, " ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের নিজেকে রক্ষা করার সবচাইতে ভাল উপায় কী? তিনি বলেন- জিহ্বা কে সংযত কর, নিজ বাসঘরের গোপনীয়তা রক্ষা কর এবং তোমার মন্দ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদো।"[৮]

সাহল ইবন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "যে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থান এর হেফাজত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের ওয়ালি হয়ে যাব।"[৯]

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "যে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।"[১০]

অতএব কথা ভাল হতে পারে যে ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয় অথবা মন্দ, যে ক্ষেত্রে তা হারাম।

নবী করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "আদম সন্তান যা ই বলে থাকে সবই তাদের বিপক্ষে যায় শুধুমাত্র ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, খারাপ কাজে বাধা দেওয়া ও মহা পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ করা। এই হাদিস টি বর্ণিত হয়েছে উম্মে হাবিবা থেকে আত-তিরমিজি ও সুনান ইবন মাজাহ তে।"[১১]

উমার ইবন আল-খাত্তাব আবু বকর এর বাসায় দেখা করতে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন আবু বকর তার আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা টেনে বের করে আনতে চাইছেন। উমার বললেন- "থামেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" আবু বকর উত্তরে বললেন- "এই জিহ্বা আমাকে বিপদজনক জায়গায় নিয়ে গেছে।"[১২]

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন- আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই, জিহ্বার চাইতে আর কোন কিছু দীর্ঘ শাস্তি লাভ করার যোগ্যতা রাখে না। তিনি আরও বলতেন- হে জিহ্বা, ভাল বল এবং তুমি লাভবান হবে, মন্দ বলা থেকে বিরত থাক এবং তুমি নিরাপদে থাকবে; অন্যথায় তুমি কেবল ই পরিতাপ করবে।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, ইবন আল-আব্বাস বলেন- মানুষ শেষ বিচারের দিনে শরীরের কোন অংশের জন্য ততটা ব্যতিব্যস্ত হবে না যতটা সে নিজের জিহ্বার জন্য হবে যদি না সে তা ভাল কাজে ব্যবহার করে থাকে।

আল-হাসান বলেন- যে তার নিজের জিহ্বা সংযত রাখতে পারল না সে তার দ্বীন ই বুঝল না।

জিহ্বার সবচাইতে কম ক্ষতির ভুল হল যা নিজের সম্পর্কিত নয় তা নিয়ে আলোচনা করা। হাদিসে এসেছে- "ইসলামে একজন মানুষের গুন হল যা নিজের বিষয় নয় সে ব্যাপারে কথা না বলা।"[১৩]

আবু উবাইদা হতে বর্ণিত, আল-হাসান বলেন- আল্লাহ কর্তৃক একজন বান্দাকে পরিত্যাগের চিহ্ন হল তাকে অপরের বিষয়াদি দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলা।

সাহল বলেন- যে এমন কথা বলে যা তার সাথে সম্পৃক্ত নয় সে সত্যবাদিতা থেকে বঞ্চিত হল।

আমরা আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ভুল। এর চাইতেও বর ভুল হল গীবত করা, গল্প করা, অশ্লীল ও বিভ্রান্তিকর কথা বলা, রিয়া, ঝগড়া, দ্বিমুখী ও কুটিল কথাবার্তা, কলহ বিবাদ, গান, মিথ্যা বলা, উপহাস করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং এরকম আরও অনেক রয়েছে যা মানুষের জিহবাকে কলুষিত করতে পারে, মনকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সুখ সমৃদ্ধি বিনষ্ট করে দিতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে পানাহ চাই।

অসংযত দৃষ্টি

অসংযত দৃষ্টি মানুষের অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি করে যা সে দেখে এবং তার হৃদয়ে এর প্রতিফলনে সাহায্য করে। এটা অনেক ধরণের অবক্ষয় তৈরি করতে পারে মানুষের মনে। নিম্নে তার কিছু উদাহরন দেওয়া হল।

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "দৃষ্টি হল শয়তানের বিষমাখা তীর। যে কেও আল্লাহর জন্য দৃষ্টি নিচু করবে আল্লাহ তার জন্য অন্তর শীতলকারী রহমত নির্ধারণ করবেন যা সে যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সেদিন উপলব্ধি করবে।"[১৪]

শয়তান দৃষ্টিকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করে, একে নিয়েই সে ভ্রমন করে বাতাসের চাইতেও দ্রুতবেগে। সে প্রকৃত জিনিষকে আরও বেশি লোভনীয় করে তোলে এবং তাকে পুজা করার প্রতিমায় পরিনত করে। এরপর সে মিথ্যা পুরস্কারের কথা বলে চাহিদা প্রজ্জলিত করে এবং মন্দ কাজ দ্বারা এর ইন্ধন জোগাতে থাকে যা একজন মানুষ কখনই করত না যদি না সে এর বিকৃত প্রতিচ্ছবি না পেত।

এটা হৃদয়কে বিভ্রান্ত করে তুলে এবং উপকারী বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটা মন ও এসবের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে চাহিদা ও অজ্ঞতার ফাঁদে নিমজ্জিত করে। আল্লাহ, মহৎ ও ঐশ্বর্যময়, বলেন-

"যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।" (১৮:২৮)

অসংযত দৃষ্টি তিনটি ব্যাধি তৈরি করে।

বলা হয়ে থাকে যে চোখ ও মনের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যদি চোখ খারাপ হয় তবে তা মনকেও গ্রাস করে। এটা একপ্রকারের আবর্জনার স্তূপে পরিনত হয় যেখানে সকল নোংরামি, অশ্লীলতা ও পচানি যুক্ত হয় এবং এখানে আল্লাহর জন্য কোন ভালবাসা থাকে না, তাঁর যে কোন বিষয়ে, তাঁর অস্তিত্ব এর ব্যাপারে এবং তাঁর সান্নিধ্যে থাকার যে আনন্দ তা বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে; শুধুমাত্র এসবের বিপরীত ই এ ধরণের কাজ করতে পারে।

অসংযত ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আল্লাহর নিকট অবাধ্যতার শামিল।

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।” (২৪:৩০)

একমাত্র সে ই খুশি থাকতে পারে যে এই পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে এবং একমাত্র আল্লাহর খিদমতকারী বান্দাই পরকালে মুক্তি লাভ করবে।

অন্যদিকে, দৃষ্টিকে অসংযতভাবে চলতে দিলে তা অন্তরকে অন্ধকার দ্বারা আবৃত করে ফেলে ঠিক তেমনিভাবে সংযত দৃষ্টি কে আল্লাহ আলোর পোশাক দ্বারা আবৃত করে দেন। আল্লাহ একই সুরাতে অন্য আয়াতে বলেন-

“আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।” (২৪:৩৫)

যখন মন আলোকিত হয় তখন অগণিত সাফল্য আসতে থাকে সব দিক থেকে। যদি তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন মন্দ ও দুঃখের মেঘ এসে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে।

অসংযত দৃষ্টি সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে অন্তরকে অন্ধ করে ফেলে। সুন্নাহ ও বিদ’আত এর ব্যাপারেও। আর সংযত দৃষ্টি একে সত্য, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করে তোলে।

জ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকেন- যে কেও তার বাহ্যিক আচরণ সুন্নাহ অনুযায়ী করে থাকে, তার অন্তরকে গভীর চিন্তার মাধ্যমে সম্পদশালী করে, নিজেকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে রাখে এবং সন্দিগ্ধ ব্যাপারগুলো বর্জন করে, আর পুরোপুরি হালাল রিজিক ভক্ষন করে- তার অন্তর কখনো কলুষিত হতে পারে না।

এভাবেই তার জন্য পুরস্কার আসতে থাকে। যে তার দৃষ্টিকে সংযত করবে আল্লাহ তার অন্তরকে আলো দ্বারা আলোকিত করবেন।

অধিক ভোজন

পরিমিত খাবার হৃদয়ের কোমলতা, মেধার শক্তি, নম্রতা, কামনা বাসনা বর্জন এবং মানসিক সচ্ছলতার নিশ্চয়তা দেয়। অনিয়ন্ত্রিত ভোজন এর বিপরীত করে থাকে।

আল-মিকদাম ইবন মা’দ ইয়াকরিব বলেন- আমি রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- “আদম সন্তান তার পেটের চাইতে অন্য পাত্র এভাবে পরিপূর্ণ করে না যা আল্লাহর কাছে নিতান্তই অপ্রিয়। তার জন্য কয়েক টুকরাই যথেষ্ট নিজেকে সতেজ রাখার জন্য। সে যদি তা পূর্ণই করতে চায় তবে সে যেন এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা আর এক তৃতীয়াংশ খালি রাখে শ্বাস প্রশ্বাস এর জন্য।”[১৫]

অতিরিক্ত ভোজন অনেক ধরণের ক্ষতি করে থাকে। এটা আল্লাহর প্রতি অবাধ্য করে ফেলে এবং ইবাদাত ও আনুগত্য তার কাছে কস্তদায়ক মনে হয়। পরিপূর্ণ ভোজন অনেক মন্দ কাজের জন্ম দেয় এবং আনুগত্য করাতে বাধা দান করে। যে কেও তার উদরকে পূর্তি করা থেকে বিরত রাখতে পারবে সে একপ্রকারে একটি মন্দ কাজ থেকেই নিজেকে দূরে রাখল। একজন উদরপূর্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রন করা শয়তানের পক্ষে খুবই সহজ। একারনেই হাদিসে এসেছে- “উপবাসের মাধ্যমে শয়তানের পথকে নিবৃত্ত কর।”[১৬]

এটা বর্ণিত আছে যে যখন ইসরাইল গোত্র থেকে একদল যুবক যখন ইবাদাত করছিল এবং তখন তাদের উপবাস ভঙ্গ করার সময় এসে গেল, তখন একজন উঠে দাঁড়াল এবং বলল- বেশি ভোজন করো না, তাহলে বেশি পান করতে হবে এবং ঘুমও বেশি আসবে; আর তখনি সব ক্ষতি হয়ে যাবে।

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা প্রায়শই ক্ষুধার্ত থাকতেন। যদিও তা খাদ্য সংকট এর কারণে হত, আল্লাহ তাঁর রাসুল এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক অনুকূল পরিবেশ ই নির্ধারণ করেছেন। একারনেই ইবন উমার ও তাঁর বাবা অধিক সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাদ্যাভ্যাস আয়ত্ত করেছিলেন। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত- "মদিনা আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মুহাম্মাদ এর পরিবার কখনো টানা তিন দিন গমের তৈরি রুটি পরিপূর্ণভাবে খাননি।"[১৭]

ইব্রাহিম ইবন আদ'হাম বলেন- "যে কেও তার উদরকে নিয়ন্ত্রন করবে, দ্বীন তার নিয়ন্ত্রনে থাকবে এবং যে কেও তার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রন করবে, ভাল ব্যাবহার তার নিয়ন্ত্রনে থাকবে। আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা পরিপূর্ণ উদরপূর্তি থেকেই আসে এবং ক্ষুধার্ত মানুষ থেকে তা অনেক দূরে থাকে।"

অসৎ সঙ্গ

অপ্রয়োজনীয় সাহচর্য দুরারোগ্য ব্যাধি যা অনেক ক্ষতি করে থাকে। ভুল মানুষের সাহচর্য ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করার ফলে অন্তরে মতভেদ তৈরি হয় যা অফুরন্ত সময় ব্যয় করেও দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। এসব সাহচর্যের কারণে যে কেও দুনিয়া ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রাখে।

একজন মানুষের অবশ্যই তার সাহচর্য থেকে উপকার লাভ করা উচিত। এজন্য তার সঙ্গকে চার ভাগে ভাগ করতে হবে এবং এদেরকে একত্রে মেশানো যাবে না। যদি তা হয়ে থাকে তখন মন্দ তাকে পেয়ে বসবে।

প্রথম প্রকারের সঙ্গ হল খাবারের মত যা দিনে রাতে প্রয়োজন হয়। যখন সে একবার এর প্রয়োজন মেটায় তখন সে পরবর্তী প্রয়োজন এর জন্য অপেক্ষা করে। এরা হল তারা যারা আল্লাহর জ্ঞান রাখে- তাঁর আদেশ, তাঁর শত্রুদের কৌশল এবং মনের ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এর ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখে। এ ধরণের ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা এক প্রকারের সফলতাই।

আর এক প্রকারের সঙ্গ হল ওষুধ এর মত। তাদের কেবল তখনি প্রয়োজন পড়ে যখন রোগের আবির্ভাব হয়। সুস্থ থাকলে এদের সাহচর্যের কোন প্রয়োজন নেই। যাহোক, জীবন রক্ষা, ব্যবসা, পরামর্শের জন্য এ ধরণের সাহচর্যের মাঝে মাঝে দরকার পড়ে। যখন এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন তাদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

তৃতীয় প্রকার হল তারা যারা ক্ষতিকর। তাদের সাথে মেলা মেশা করা যে কোন ভাবেই ব্যাধির সমতুল্য। তাদের একজন বা কয়েকজনের সাথে মেশা হল অনারোগ্য ব্যাধির মত। একজন মানুষ কখনই এ ধরণের ব্যক্তির সাহচর্যে লাভবান হতে পারে না হোক তা দুনিয়ায় কিংবা আখিরাতে। এবং তা কোন না কোনোভাবে দ্বীনের ক্ষতি করবে এবং জীবিকারও। যদি তাদের সাহচর্য কাওকে আঁকড়ে ধরে তবে তা প্রাণনাশক ও আতঙ্কিত রোগ হিসেবে দেখা দেয়।

এধরনের সঙ্গ কখন ভাল কিছু বলে না বা ভাল কিছু শূনতেও চায় না। তারা তাদের আত্মাকে চিনে না এবং নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদেরকে ভাল কিছু বললে তা তাদের কাছে বেত্রাঘাত এর মত মনে হয় অথচ তারা তাদেরকে নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ব্যস্ত থাকে এবং নিজেদের কথায় উল্লাস করে থাকে।

তারা তাদের সংশ্রবে উৎকণ্ঠার জন্ম দেয় যদিও তারা মনে করে থাকে যে তারাই হল ঐ বৃত্তের মধ্যমণি। যদি তারা চুপ থাকে, তবে তা পাষাণভার এর চাইতেও ভারি হয় যা বহন করা বা ভুমিতে টানা কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে।

এধরনের ব্যক্তির সাথে মেশা মনের জন্য ক্ষতিকর যদিওবা তা ত্যাগ করা অনিবার্য। এটা একজন মুমিনের জন্য পরিতাপের বিষয় যে সে এ ধরণের লোকের সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে তার সাথে ভাল ব্যাবহার চালিয়ে যেতে হবে বাহ্যিকভাবে, তার অন্তর্নিহিত কোন বিষয়ই গ্রহণ করা যাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন।

চতুর্থ প্রকার হল তারা যারা নিজেরাই সর্বনাশপ্রাপ্ত। এটা হচ্ছে বিষ গ্রহণ করার মত, এর শিকার হয় প্রতিষেধক খুঁজে নেয় নতুবা ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক লোকই এর অন্তর্ভুক্ত। তারা হল দ্বীন এ নতুন বিষয় আনয়নকারী এবং পথভ্রষ্ট লোক যারা রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর বরখেলাফ করে এবং অন্য তরিকা গ্রহণ করে। তারা একে বলে থাকে বিদ'আ হাসানাহ ও তদ্বিপরীত। একজন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কখনই এদের সাথে বসা বা চলা উচিত নয়। এ ধরণের লোকের সাহচর্যের পরিনাম হল হৃদয়ের মৃত্যু অথবা গুরুতর অসুস্থতা।

মনকে জীবন ও খাদ্য দানকারী উপকরণ ?

সকলেরই এ ব্যাপারে অবগত থাকা উচিত যে ইবাদাত হল মানুষের মনের জন্য ঠিক তেমনিভাবে উপকারি যেমনভাবে খাদ্য ও পানীয় শরীরের জন্য উপকারি। সকল মন্দ কাজই বিষাক্ত খাবারের মত যা অবধারিতভাবে মনের ক্ষতি করে থাকে।

বান্দার অবশ্যই আল্লাহর ইবাদাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা উচিত যিনি মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যময়, কারণ বান্দার সবসময়ই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

তার শরীরের সমৃদ্ধি বজায় রাখার লক্ষে তার সতর্কতার সহিত খাদ্য সংযম করা উচিত। তার সর্বদাই ভাল খাবার নিয়মিত ভক্ষন করা উচিত এবং ভুলক্রমে ক্ষতিকর কিছু খেয়ে ফেললে তা তাড়াতাড়ি পেট থেকে বের করে দিতে হবে।

বান্দার মনের সমৃদ্ধি তার শরীরের সমৃদ্ধির চাইতেও বেশি জরুরি। সুস্থ শরীর তাকে যেভাবে এই দুনিয়াতে কোন রোগ ছাড়া চলতে সাহায্য করবে ঠিক তেমনিভাবে সুস্থ মন তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিবে।

একইভাবে, মৃত্যু যেভাবে বান্দাকে এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, মনের মৃত্যুও তাকে চিরস্থায়ী যন্ত্রণার বন্দোবস্ত করে দেয়। জ্ঞানীরা বলে থাকেন- আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষ মৃত শরীরের জন্য শোক করে থাকে কিন্তু মৃত মনের জন্য তা করে না বস্তুত মৃত মন আরও বেশি ভয়াবহ।

অতঃপর ইবাদাত হল মনের সুস্থতার অপরিহার্য উপকরণ। নিচের ইবাদাত গুলো উল্লেখ না করলেই নয় যেহেতু তা বান্দার হৃদয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারি এবং প্রয়োজনীয়।

আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর নিকট তওবা করা, দুয়া করা, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পেশ, এবং কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত।

টীকাঃ

(১) যইফ হাদিস, আল-মুনযারি, ৩/২৩৪; এবং আল-ইরাকির আল-ইহ'ইয়া গ্রন্থে ৮/১৫৩৯

(২) যইফ হাদিস, আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ,৭/৯২ গারীব, শুধুমাত্র ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ ইবন হাতিব, যার কথা আয-যাহাবী বলেছেন, ১/৪৩, এই বলে যে এই গারীব হাদিসটি তার থেকেই এসেছে

(৩) যইফ হাদিস, ইবন হিব্বান ও আল-বায়হাকী, এবং আল-ইরাকির আল-ইহ'ইয়া গ্রন্থে ৮/১৫৪১

(৪) সহিহ হাদিস, আত-তিরমিজি, আল-হাকিম, আয-যাহাবী

(৫) সহিহ হাদিস, আত-তিরমিজি ও আহমাদ, এছাড়াও আল-হাকিম, আয-যাহাবী

(৬) আল-বুখারী, কিতাব আর-রিকাক এবং মুসলিম, কিতাব আয-যুহদ

(৭) আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ, হাদিসটি হাসান

(৮) আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ, হাদিসটি হাসান তবে একটু ভিন্ন শব্দাবলী দ্বারা বর্ণিত। আবু না'ইম দ্বারা আল-ইহ'ইয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

(৯) আল-বুখারী, কিতাব আর-রিকাক, ১১/৩০৮ এবং কিতাব আল-হুদুদ, ১২/১১৩

(১০) আল-বুখারী, কিতাব আর-রিকাক, ১১/৩০৮; মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, ২/১৮

(১১) আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ এবং ইবন মাজাহ, কিতাব আল-ফিতান, হাসান গারীব। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন খানিস থেকে বর্ণিত

(১২) হাসান, আবু-ইয়া'লার মতে, বায়হাকী ও আস-সুয়ুতী

(১৩) সহিহ, আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ, ৬/৬০৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২০১; আস-সা'আতি, আল-ফাতহ আর-রাব্বানি, ১৯/২৫৭, আন-নববীর চল্লিশ হাদিসের মধ্যে ১২ তম হাদিস

(১৪) যইফ, আত-তাবারানী, ৮/৬৩; আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩১৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৬৪

(১৫) সহিহ, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১৩২; আস-সা'আতি, আল-ফাতহ আর-রাব্বানি, ১৭/৮৮; আত-তিরমিজি, কিতাব আয-যুহদ, ৭/৫১

(১৬) যইফ, আল-গাজ্জালির আল-ইহ'ইয়া গ্রন্থে ৮/১৪৮৮

(১৭) আল-বুখারী, কিতাব আল-আত'ইমা, ৯/৫৪৯ এবং মুসলিম, কিতাব আয-যুহদ, ৮/১০৫

(১৮) আশ-শাফিঈ বলেন- "যখন কোন ক্লান্তিকর ব্যক্তি আমার পাশে বসে, সে যে পাশে বসে সে পাশ টা আমার কাছে নিচু মনে হয় অন্য পাশের চাইতে।"

পরিচ্ছেদ ০৬

আল্লাহর স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত

ইবন তাইমিয়া লিখেছিলেন- আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে হৃদয়ে মাছকে পানি দেওয়ার মতই। যখন মাছকে পানি থেকে বের করে ফেলা হয় তখন তার কী হবে? ইমাম শামস আদ-দীন আল-কাইয়িম তার আল-ওয়াবিল আল-সাইয়িব গ্রন্থের যিকরুল্লাহ অধ্যায়ে অন্তত আশি টি উপকারের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে এর কয়েকটির উল্লেখ করব তথাপি পাঠকদের অনুরোধ করব এই মহামূল্যবান বইটি সংগ্রহে রাখার জন্য।

হৃদয় এবং আত্মার জীবনধারণের উপকরণ হল আল্লাহর স্মরণ। বান্দা যখন এর থেকে বঞ্চিত হয় তখন তা খাদ্যহীন শরীরের মত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর যিকর শয়তানকে দূরে রাখে, তাকে দমন করে ও ভেঙ্গে দেয়, যা আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক, যিনি মহাশক্তিমান ও ঐশ্বর্যময়, মন থেকে দুঃখ ও বেদনা দূরীভূত করে দিয়ে তা সুখ ও আনন্দে পরিনত করে, মুখ ও অন্তরকে আলো দ্বারা আলোকিত করেন এবং তাকে মর্যাদা, নম্রতা ও শীতলতা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। যা ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর ভয় ও তাঁর যে কোন বিষয়াদির প্রতি ঘনীভূত হতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

“সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো।”(২:১৫২)

এটাই যদি একমাত্র পুরস্কার হয় আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য তবে এটাই অপরিসীম করুনা ও দয়া যে বান্দার মন সর্বদা মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ ও দূরে থাকবে।

যদিও আল্লাহর স্মরণ হল সবচাইতে সহজ ইবাদাত, তবুও তা যে অপরিসীম করুনা ও দয়া বহন করে আনে তা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভম্পর হয় না। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই; তিনিই সবকিছু উপর ক্ষমতাবান- এই দুআ দিনে একশ বার পাঠ করে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে, তার আমল নামায় একশ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে একশ গোনাহ মুছে দেওয়া হবে । আর তা ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান (তার কুমন্ত্রণা) থেকে তার জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যায় । সেদিন সে যা করেছে তার চেয়ে অধিক পূণ্যবান কেউ হবে না । কিন্তু কেউ তার বেশী আমল করলে তার কথা ভিন্ন । আর যে ব্যক্তি দিনে একশ- বার আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি পাঠ করবে, তার যাবতীয় গোনাহ মোচন করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেলার সমতুল্য হয়।”[১]

জাবির থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “যে ব্যক্তি ‘সকল মহিমা আল্লাহর জন্য এবং সকল প্রসংশা তাঁরই প্রাপ্য’ বলবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হবে।”[২]

ইবন মাস’উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- আল্লাহর প্রশংসা করা আমার কাছে তাঁর রাস্তায় সমপরিমান দিনার ব্যয় করার চাইতেও বেশি পছন্দনীয়।

আল্লাহর স্মরণ কঠিন অন্তরের জন্য মহা প্রতিষেধক। এক ব্যক্তি একদা –আল-হাসান কে বললেন- ও, আবু সাই’য়িদ, আমি তোমার কাছে আমার অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করছি। তিনি বলেন- আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে একে কোমল কর। মাখুল বলেন- আল্লাহর স্মরণ হল সু স্বাস্থ্যর চিহ্ন আর মানুষের স্মরণ হল

রোগের মত। এক ব্যক্তি একদা সালমানকে বলল- কোন কাজটি সবচাইতে উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন- তুমি কি কুরআনে পড়নিঃ

“আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।”(২৯:৪৫)

আবু মুসা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “যে আল্লাহর যিকর করে এবং যে করে না তারা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতই।”[৩]

আব্দুল্লাহ ইবন বুসর থেকে বর্ণিত, একবার এক লোক রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল- ভালর পথ অসংখ্য এবং আমি সবগুলো পথ বেছে নিতে অসমর্থ, তাই আমাকে এমন পথ বলে দিন যাতে আমি নিরবচ্ছিন্ন থাকতে পারি এবং যা আমার জন্য বোঝা হয়ে না যায়। তিনি বললেন- “তোমার জিহ্বা যাতে সংযত থাকে এবং একে আল্লাহর স্মরণ দ্বারা কোমল রাখো।”[৪]

নিয়মিত আল্লাহর স্মরণ পুনরুত্থান দিবসে তার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে। এটা এমন একটা মাধ্যম যা তাকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে যেমন গীবত করা ও তা বলে বেড়ানো ইত্যাদি। জিহ্বা দুটি কাজই করতে পারে হয়ত সে আল্লাহর স্মরণ করে নতুবা তা মন্দ বলাতে ব্যস্ত থাকে।

যার যিকর করার দরজা খোলা থাকে তার জন্য আল্লাহর দরজাও খোলা থাকে যার মাধ্যমে সে যা চায় তাই পায়। যদি সে আল্লাহকে খোঁজ করে তবে সে সবকিছুই পেয়ে গেল আর যদি সে তা মিস করে তবে সে সবকিছুই হারাল।

বিভিন্ন ধরণের যিকর রয়েছে। আল্লাহর নামসমূহের যিকর, তাঁর বৈশিষ্ট্য সমূহের যিকর, তাঁর প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর যিকর। সবগুলো যিকর ই এ ধরণের হতে পারে যেমন ‘সকল মহিমা আল্লাহর জন্য’ ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’ ‘আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই’ অথবা তিনি যা আদেশ নিষেধ করেছেন তা উল্লেখ করে যেমন ‘আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও ক্ষমতাবান, এই এই করতে আদেশ করেছেন এবং এই এই কাজ করতে বারণ করেছেন।’

একজন বান্দা আল্লাহ প্রদত্ত রহমতের কথা উল্লেখ করেও তাঁর স্মরণ করতে পারে যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হল কুরআন তিলাওয়াত করা কারণ এতে সকল প্রকার ব্যাধির ওষুধ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

“হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।” (১০:৫৭)

এবং আরও বলেছেন-

“আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।” (১৭:৮২)

অন্তরের সকল ব্যাধি কামনা বাসনা ও সন্দেহ থেকে সৃষ্টি হয় এবং পবিত্র কুরআনে উভয়েরই প্রতিকার রয়েছে। এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে স্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন রয়েছে সত্য মিথ্যা নিরুপনের জন্য এবং এভাবে এটি জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি জনিত সন্দেহকে দূরীভূত করে।

যে কেও কুরআন অধ্যয়ন করে এবং অন্তরে তা গেঁথে নেয়, সে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে সেভাবে সক্ষম হয় যেভাবে সে দিন রাত পার্থক্য করতে পারে।

অন্যদিকে কামনা বাসনা থেকে সৃষ্ট ব্যাধির প্রতিকারের জন্য এর রয়েছে বিজ্ঞতা ও সু পরামর্শ। এটা দুনিয়াবী ভোগ বিলাস থেকে দূরে রাখে এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "যে কেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কে ভালবাসাতে চায়, সে যেন কুরআন পাঠ করে।"[৫]

কুরআন বান্দাকে আল্লাহর নিকট আনয়নের জন্য এক উত্তম মাধ্যম। খাব্বাব ইবন আল-আরাত এক ব্যক্তিকে বলেন- যতটুকু সম্ভব আল্লাহর নিকটে যাও এবং মনে রেখ তুমি এটা তাঁর শব্দাবলী ছাড়া অন্য কিছু দিয়েই ততটা সুফল লাভ করবে না।

ইবন মাস'উদ বলেন- "যে কেও কুরআন কে ভালবাসে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল কেই ভালবাসে।" উসমান ইবন আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "তোমার অন্তর যদি সত্যি ই পবিত্র হয়ে থাকে তবে তুমি আল্লাহর কালাম পড়ে কখনো ক্ষান্ত হবে না।"

এক কথায় বলতে গেলে বান্দার জন্য সবচাইতে উপকারী হল সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ বলেন-

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।" (১৩:২৮)

সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হল আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন।

টীকাঃ

(১) আল-বুখারী, কিতাব আদ-দাওয়াত, ১১/২০১; মুসলিম, কিতাব আয-যিকর ওয়াদ দুয়া, ১৭/১৬

(২) সহিহ, আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৪৩৩

(৩) আল-বুখারী, কিতাব আদ-দাওয়াত, ১১/২০৮; আল-হাকিম, কিতাব আদ-দুয়া, ১/৪৯৫

(৪) আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৩১৪

(৫) যইফ, মুনকার, ইবন হাজার এর তাহদ'হীব আত-তাহদ'হীব, ২/২২২; লিসান আল-মিজান, ২/২৮৫; এবং আস-সুয়ুতীর আল-জামি আস-সাগীর, ৬/১৫০ এর নোট দ্রষ্টব্য

পরিচ্ছেদ ০৭

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি ভুল কর্মের ক্ষতিকারক ফল হিসেবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং তা ভুলের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বারবার এসেছে, এবং কয়েক জায়গায় আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও সমুচ্চ, বলেন;

"তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (৭৩:২০)

"তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" (৩:১৭)

"যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।" (৪:১১০)

তওবা হল ঘনঘন অনুশোচনাবোধ করা, যা এক পর্যায়ে গিয়ে মৌখিক তওবায় রুপ লাভ করে। অনুশোচনার অর্থই হল শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসা। এটি আল্লাহর কাছে দুয়া করার সমতুল্য যা আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এটা বিশেষভাবে সত্য যদি কোন খারাপ কাজ করার পর দুয়া সরাসরি মন থেকে আসে, অথবা যখন দুয়া করা হয় তখন তা যেন ভোরের প্রথম দিকে হয় বা ফরজ সালাত এর পর।

লুকমান (আলাইহিস সালাম) একদা তাঁর ছেলেকে বললেন- "আমাকে ক্ষমা কর, ও আল্লাহ" এই শব্দগুলো উচ্চারন করা তোমার জিহবার অভ্যাসে পরিণত করে ফেল, কারণ এমন অনেকে মুহূর্ত রয়েছে যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিরাশ করেন না।

আল-হাসান বলেন- "আল্লাহর কাছে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা কর- তোমার ঘরে, টেবিলে, রাস্তায়, মার্কেটে, মিটিং এ, যখন যেখানে থাকো কারণ তুমি জান না কখন তুমি আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে।"

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "আল্লাহর শপথ, আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে তওবা করি।"[১]

আবু হুরায়রা বলেন, আমি রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বলতে শুনেছি- এক বান্দা গুনাহ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, গুনাহ ক্ষমা করেন এবং শুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এ কথা বলার পর সে পূনরায় গুনাহ করল এবং বলল, হে আমার মনিব! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। এরপর আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার এক বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ করে বলল, হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। একথা শুনে আল্লাহ তাআলা আবারও বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে তার একজন মালিক আছে, যিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে

পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ মাফে করে দিয়েছি। বর্ননাকারী আবদুল আ'লা বলেন, "এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর" মহান আল্লাহ কথাটি তিনবার বললেন।[২]

এটার মানে এই যে উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়েছে এই জন্য যে সে প্রতিবারই গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে তওবা করেছে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তওবা গুনাহ পরিত্যাগ করার প্রয়াসে না হয় ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত- "সেই সফল ব্যক্তি যে শেষ বিচারের দিনে যার আমলনামায় অনেক বেশি তওবার দুয়া মজুদ থাকবে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে তওবা হল সকল মন্দ কাজের প্রতিষেধক।

কাতাদা বলেন- "এই কুরআন তোমাকে তোমার ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পথ দেখাবে। তোমার অসুস্থতা হল তোমার গুনাহগুলো আর তার ওষুধ হল আল্লাহর নিকট তওবা করা।"

আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান তাকে কখনো তওবা করতে উৎসাহিত করেন না।"

টীকাঃ

(১) আল-বুখারী, কিতাব আদ-দাওয়াত, ১১/১০১

(২) আল-বুখারী, কিতাব আত-তাওহীদ, ১৩/৪৬৬; মুসলিম, কিতাব আয-যিকর ওয়াদ-দুয়া, ১৭/৭৫

পরিচ্ছেদ ০৮

দুয়া

আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও ক্ষমতাবান, আমাদেরকে আন্তরিক তওবা করতে আদেশ করেছেন এবং তা কবুলেরও ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন-

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" (৪০:৬০)

এরপর তিনি উল্লেখিত আয়াতে বলেন-

"অবশ্যই যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (৪০:৬০)

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যার রয়েছে সীমাহীন দয়া ও অসীম করুনা। তিনি বান্দার কৃত চেষ্টা ও কাজসমুহকে গ্রহণযোগ্য ইবাদাতে পরিনত করেন দুয়ার মাধ্যমে যা তিনি আদেশ করেছেন এবং বান্দা কর্তৃক উপেক্ষিত কাজগুলোর ব্যাপারে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন তাকে উদ্ধত চিহ্নিত করে।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "যে কেও আল্লাহর নিকট তওবা থেকে বিমুখ, সে তাঁর ক্রোধের স্বীকার।"[১]

বলা হয়ে থাকে যেঃ

আদম সন্তানকে বলো না করতে কোন ইচ্ছে পূরণ

তাঁকেই বল যার দরজা কখনো থাকে না গোপন

আল্লাহ হয় বিমর্ষ যখন তুমি না চাও

যেথায় আদম সন্তান হয় উত্তাপিত যখন তুমি চাও

আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যময়, বলেন-

"বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন?" (২৭:৬২)

অন্য আয়াতে বলেন-

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।" (২:১৮৬)

আন-নুমান ইবন বাশীর বলেন, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- দুয়া হল প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত। এরপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। অবশ্যই যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (৪০:৬০)[২]

উপরের আয়াতের মর্মার্থ হল যে কোন দুয়া যদি তা আবশ্যিক শর্তাধীনে হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হবে। এটি আবার নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে-

"আল্লাহ, যিনি চিরস্থায়ী ও সর্বাধিক উদার, এবং কেও যদি তওবার নিমিত্তে দুহাত উঁচু করে তবে আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[৩]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "তওবা করা থেকে বিরত হইয়ো না কারণ যে তওবা করে না তার ধ্বংস অনিবার্য।"[৪]

আবু সায়্যিদ আল খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- "একজন মুসলিমের দুয়ার ফল আল্লাহ তিনভাবে প্রদান করে থাকেনঃ সে যা চায় তা তৎক্ষণাৎ দিয়ে থাকেন; অথবা তা তার জন্য শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সংরক্ষন করে রাখেন; অথবা তা তাকে কোন বিপদ থেকে প্রতিহত করে যতক্ষণ না তা কারো ক্ষতি বা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে।"[৫]

উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "আমি দুয়া কবুল নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, বরং আমি স্বয়ং দুয়া নিয়েই চিন্তিত, কারণ যে দুয়া করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে রহমতপ্রাপ্ত, সে দুয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন।"

দুয়া করার সঠিক পন্থা

এর মধ্যে রয়েছে দুয়া করার বিশেষ সময় নির্বাচন, যেমন বছরের মধ্যে আরাফার দিন, মাসের মধ্যে রমজান মাস, সপ্তাহের মধ্যে শুক্রবার এবং দিনের প্রথম ভাগে (ভোরে) দুয়া করা।

এছাড়াও অনুকূল পরিস্থিতি নির্বাচন ও গুরুত্বপূর্ণ, যেমন বৃষ্টির সময়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মুহূর্তে এবং সিজদারত অবস্থায়। আবু হুরায়রা বলেন, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- "বান্দা যখন সিজদায় যায় তখন সে আল্লাহর সবচাইতে নিকটে থাকে, তাই তোমরা অধিক সময়ব্যাপি সিজদা কর।"[৬]

আযান ও ইকামাত এর মধ্যবর্তী সময়ও দুয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "আযান ও ইকামাত এর মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দুয়া কখনো বৃথা যায় না।"[৭]

দুয়া করার সময় দৃঢ় ও এর ফল লাভের ব্যাপারে অবিচল থাকা উচিত। রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "তোমাদের কেও যাতে 'ও আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা কর' অথবা 'ও আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমার উপর রহম কর' এ ধরনের কথা না বলে বরং তার উচিত সবসময় আল্লাহর কাছ থেকে দৃঢ়ভাবে আদায় করে নেয়া, যেহেতু কেওই আল্লাহকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না।"[৮]

দুয়ার পূর্বে ওযু করে নেয়া, কিবলার দিকে মুখ করে দুয়া করা ও দুয়া তিনবার বলা উত্তম।[৯]

আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে দুয়া শুরু করা উচিত, তাঁর গুনবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্যসমুহ উচ্চারণ করে এবং এর পর পরই মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তাঁর রহমত এর কথা উল্লেখ করতে হবে। এরপর দুয়াকারী তার প্রয়োজন ও ইচ্ছার কথা তুলে ধরবে এবং সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা জ্ঞাপন করে দুয়া শেষ করবে।

এখানে ইখলাস সহকারে দুয়া করতে হবে এবং এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এর দ্বারা যাতে কারো ক্ষতি বা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না হয়।

দুয়াকারী যেন খুব দ্রুত ফল লাভের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করে এবং আমি দুয়া করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দুয়া কবুল করেননি এই ধরনের কথা যাতে না বলে। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "তোমাদের যে কারো দুয়া আল্লাহ কবুল করে থাকেন এই শর্তে যে সে অসহিষ্ণুতা বশত 'আমি চেয়েছিলাম কিন্তু আমার দুয়া কবুল হয়নি' কথা বলে না ফেলে।"[১০]

ইবন বাত্তাল বলেন- "এক্ষেত্রে যা প্রতীয়মান হয় তা হল তওবাকারী হতাশ হয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী তওবা করা ছেড়ে দেয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির দুয়া যা সে দ্রুত ফল লাভের জন্য পর্যাপ্ত মনে করে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোন বিলম্ব ছাড়াই- যেখানে তওবাকারীর আহবানে সাড়া দেওয়াতে তার পরমশক্তি এতটুকু কমে না কিংবা তাঁর সৃষ্টির অনুরোধ পুরনে তাঁর যা কিছু আছে তা থেকে কিছুই হ্রাস হয় না।"

উক্ত হাদিসটি তওবা করার এক চমৎকার শিষ্টতার ইঙ্গিত করে, যেটা হল একজন তওবাকারীকে অবশ্যই অটলভাবে ও হতাশাগ্রস্ত না হয়ে তওবা করে যেতে হবে, কারণ এটাই প্রদর্শন করে আল্লাহর প্রতি তার পরম নির্ভরতা ও নতি স্বীকার।

টীকাঃ

(১) হাসান, আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৩১৩; ইবন মাজাহ, কিতাব আদ-দুয়া, ২/১২৫৮; আল-হাকিম, কিতাব আদ-দুয়া, ১/৪৯১

(২) আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৩১৩; আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৯১; আন-নববী, আল-আযকার, পৃ ৫২৫

(৩) হাসান, আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৫৪৪; আল-হাকিম, কিতাব আদ-দুয়া, ১/৪৯৭; আবু দাউদ, কিতাব আদ-দুয়া, ১/৪৯৭

(৪) যঈফ, আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৯১; ইবন হিব্বান, আল-আদি'ঈয়া, পৃ ৫৯৬

(৫) সহীহ আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৯২৩

(৬) মুসলিম, কিতাব আস-সালাত, ৪/২০০

(৭) সহীহ আত-তিরমিজি, কিতাব আস-সালাত, ১/৬২৪ এবং কিতাব আদ-দাওয়াত, ১০/৫৩; আবু দাউদ, কিতাব আস-সালাত, ২/২২৪

(৮) আল-বুখারী, কিতাব আত-তাওহীদ, ১৩/৪৪৮ এবং কিতাব আদ-দাওয়াত, ১১/১৩৯; মুসলিম, কিতাব আয-যিকর ওয়াদ দুয়া, ১৭/৭

(৯) মুসলিম, কিতাব আল-জিহাদ, ১২/১৫২

(১০) আল-বুখারী, কিতাব আদ-দাওয়াত, ১১/১৪০; মুসলিম, কিতাব আয-যিকর ওয়াদ দুয়া, ১৭/৫১

পরিচ্ছেদ ০৯

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠ

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।"[১]

এটা এই কারনে যে একটা ভাল কাজ দশটা ভাল কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একজন মুসলিমের জন্য রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠ করা একটি উৎকৃষ্ট কাজ।

ইবন আল-আরাবি বলেন- কেও যদি আল্লাহর "যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে (৬:১৬০)" এই আয়াতের বিশ্লেষণ করতে চায়, তবে আমাদের বলা উচিত, এর মাঝে অনেক বড় চিন্তার খোরাক রয়েছে। কুরআন বলছে যে একটি সদকাজের বদলে যে কেও তার দশগুন পাবে এবং রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠ, কুরআন অনুযায়ী তাকে জান্নাতে দশ স্তর উন্নীত করবে। রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে। আল্লাহ কর্তৃক একজন বান্দাকে স্মরণ তার সদকাজের পুরস্কারকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এর কারণ আল্লাহকে যে স্মরণ করে, তাকে আল্লাহ স্মরণ করেন। ঠিক তেমনিভাবে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে স্মরণ করে, আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন।

আল-ইরাকি বলেন- বান্দার উপর আল্লাহর রহমত তাঁর একমাত্র পুরস্কার নয়, কারণ উপরে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, তিনি আরও দশটি ভাল কাজ লিপিবদ্ধ করেন, দশটি মন্দ কাজ মুছে দেন এবং তাকে দশ স্তর উন্নীত করেন।

আনাস ইবন মালিক বলেন, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- তোমাদের কারো সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলে তার উচিত আমার উপর দরুদ পাঠ করা এবং আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "কেও যদি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে তবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন, দশটি মন্দ কাজ মুছে ফেলবেন এবং তাকে দশ স্তর উন্নীত করবেন।"[২]

রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "তোমাদের কারো সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলে তার উচিত আমার উপর দরুদ পাঠ করা" এর অর্থ ঐ সময়ে সালাম পেশ করা বাধ্যতামূলক। অপর হাদিসে এসেছে- "কৃপণ সেই ব্যক্তি যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হল অথচ সে দরুদ পাঠ করল না।"[৩]

ইবন মাস'উদ থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "পৃথিবীতে আল্লাহর একদল ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতা রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেন।"[৪]

এছাড়াও ইবন মাস'উদ থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "হাশরের ময়দানে সেই ব্যক্তিই আমার সবচাইতে নিকটে থাকবে যে সর্বদা আমার উপর দরুদ পাঠ করে।"[৫]

প্রতি শুক্রবার রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠ করা উত্তম। আউস বিন আউস হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "দিনের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ দিন হল শুক্রবার কারণ এই

দিনে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি এবং এই দিনেই তাঁকে মৃত্যু প্রদান করা হয়েছে, এই দিনেই শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এই দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। তাই এই দিনে তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ কর, তা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। নবী করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল- ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিভাবে তা পৌঁছবে যেখানে আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে? তিনি উত্তরে বলেন- আল্লাহ নবীদের দেহ ধ্বংস করা মাটির জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।”[৬]

আবু মাস’উদ আল আনসারী থেকে বর্ণিত, “আমরা সা’দ ইবন উবাদার মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এলেন। বাশীর ইবন সা’দ তাঁকে বললেন- হে আল্লাহর রাসুল, মহান আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর দরুদ পড়তে আদেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরুদ পড়ব? আল্লাহর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরুত্তর থাকলেন। পরিশেষে আমরা আশা করলাম যদি বাশীর তাঁকে প্রশ্ন না করতেন তো ভাল হত। ক্ষণেক পর রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা বল, ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহিম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।’ আর সালাম কেমন, তা তোমরা জেনেছ।”[৭]

টীকাঃ

(১) মুসলিম, কিতাব আস-সালাত, ৪/১২৮

(২) সহীহ, ইবন আস-সুন্নি, আমল আল-ইয়াওম ওয়াল-লায়লাহ, ৩৮২; মুসলিম, কিতাব আস-সালাত, ৪/১২৭

(৩)) সহীহ, আন-নিসাঈ, ফাযায়িল আল-কুরআন, ১২৫; আত-তিরমিজি, কিতাব আদ-দাওয়াত, ৯/৫৩১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২০১; আল-হাকিম, কিতাব আদ-দুয়া, ১/৫৪৯

(৪) সহীহ, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩৮৭, আন-নিসাঈ, কিতাব আস-সাহ’উ, ৩/৪৩। ইবন আল-কায়্যিম বলেন- ইসনাদ সহীহ। জালা’উল আফহা’ম, পৃ ২৩ দ্রষ্টব্য

(৫) হাসান, আত-তিরমিজি, কিতাব আল-বিত’র, ২/৬০৭; ইবন হিব্বান, মাওয়ারিদ আদ-ধাম’আন, পৃ ৫৯৪

(৬) সহীহ, ইবন মাজাহ, কিতাব আল-জানা’ইয, ১/৫২৪; আবু দাউদ, কিতাব আস-সালাত, ৩/৩৭০; আহমাদ, আল-ফাতহ আর-রাব্বানি, ৬/৯। আল-হাকিম তার কিতাব আল-জুমুয়া, ১/২৭৮ এ একে সহীহ বলেছেন

(৭) মুসলিম, কিতাব আস-সালাত, ৪/১২৩

পরিচ্ছেদ ১০

কিয়ামুল লাইল (রাতের ইবাদাত)

মহান আল্লাহ বলেন-

“আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দন্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু’তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দন্ডায়মান হয়।” (৭৩:২০)

এছাড়াও

“এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে।” (২৫:৬৪)

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- “ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম ইবাদাত হল রাতের ইবাদাত।”[১]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “ইশা ও ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগার রাকাত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতি দু রাকাত পর পর সালাম ফিরাতেন এবং সবশেষে এক রাকাত বিতর আদায় করতেন।”[২]

ইবন মাস’উদ বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে সারারাত ইবাদাত না করে ভোর অবধি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে, তিনি বলেন- “সে ঐ ব্যক্তি যার কানে শয়তান প্রস্রাব করে।”[৩]

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় শয়তান তার মাথায় তিনটা গিট লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিট লাগানোর সময় সে বলে, “এখনো অনেক রাত্র বাকী আছে” অথাৎ তুমি শুয়ে থাক। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকর করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি উযু করে তাহলে আরো একটি গিট খুলে যায়, যদি সালাত আদায় করে তাহলে সমুদয় গিট খুলে যায় এবং তার সকাল হয় আনন্দ ও উদ্দীপনায়। অন্যথায় তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়।[৪]

ইবন মাস’উদ রাতে উঠে যেতেন যখন অন্যরা সবাই ঘুমাত, এবং তার কক্ষ থেকে মৌমাছির শব্দের মত গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসত সকাল পর্যন্ত।

আল-হাসানকে একদা জিজ্ঞেস করা হল- “যারা রাত্রি যাপন করে তাদের চেহারা এত সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয় কিভাবে?” তিনি উত্তরে বলেন- “কারণ তারা তাদের রবের সাথে ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্পর্কিত এবং তিনি তাদেরকে তাঁর নূরের আলো দ্বারা কিছুটা আবৃত করেন।”

তিনি আরও বলেন- “একজন মানুষ একটি গুনাহ করার কারণে রাত্রি যাপন থেকে বঞ্চিত হয়।”

একদা এক লোক ন্যায়পরায়ণ এক ব্যক্তিকে বলল- “আমি রাত্রিযাপন করতে ব্যর্থ, আমাকে এর প্রতিকার বলুন।” ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বললেন- “তোমার রবকে দিনের বেলা অমান্য করো না তাহলে তিনি তোমাকে নিজ হাতে রাতে জাগ্রত করবেন।”

সুফিয়ান আস-সাউরি বলেন, শুধুমাত্র একটি গুনাহ করার কারণে আমি অনবরত পাঁচ মাস রাত্রিযাপন থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

ইবন আল-মুবারক বলেন-

যখন রাত নেমে আসে সম্পূর্ণ আঁধারে

তখন তা খুঁজে পায় তাদের জাগ্রত

রবের ভয় তাদেরকে করেছে নিদ্রা হতে উত্থিত

অন্যথায় নিরাপত্তার পোশাকধারীরা থাকে ঘুমন্ত

আবু সুলায়মান বলেন- "যারা রাত্রিযাপন করে তারা অনেক বেশি সন্তুষ্ট তাদের চাইতে যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। যদি রাত্রিযাপন ই একমাত্র উদ্দেশ্য না হত তবে আমি এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা পছন্দ করতাম না।"

ইবন আল-মুক্তাদির বলেন- "শুধুমাত্র তিনটি আনন্দ এই দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকে; রাত্রিযাপন করা, নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত ও জামায়াতের সাথে ফরজ সালাত আদায়।"

টীকাঃ

(১) মুসলিম, ৮/৫৪

(২) আল-বুখারী, কিতাব আল-বিতর, ২/৪৭৮; মুসলিম, কিতাব আল-মুসাফিরিন, ৬/১৬

(৩) আল-বুখারী, কিতাব আত-তাহাজ্জুদ, ৩/২৮; মুসলিম, কিতাব আল-মুসাফিরিন, ৬/৬৩

(৪) আল-বুখারী, কিতাব আত-তাহাজ্জুদ, ৩/২৪; মুসলিম, কিতাব আল-মুসাফিরিন, ৬/৬৫